Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 272 - 277
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সুপ্রিয়া সাহা
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: supriyamnp@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
মৃৎশিল্প, মূর্তি, কুমোর পাড়া, কুম্ভকার, নদীয়া রাজ, কৃষ্ণনগর।

Abstract

বৈষ্ণব ধর্মীয় আন্দোলনের পীঠস্থান নদীয়া জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ তিনটি জনপদ হল নবদ্বীপ, শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগর। নদীয়া রাজের শাসনকালে আরও নির্দিষ্ট করে বললে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়কাল থেকে কৃষ্ণনগর বঙ্গ সংস্কৃতির এক অন্যতম পীঠস্থান ছিল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কৃষ্ণনগরের পরিচিতি এবং গুরুত্ব উভয় বৃদ্ধি করার পশ্চাতে এই স্থানের মৃৎশিল্পের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ঘূর্ণির মৃৎশিল্পীদের হাতে তৈরি মাটির পুতুল ও মূর্তি তৎকালীন সময় থেকে আজও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। এই পর্বে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু মূলত কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও ঔপনিবেশিক পর্বে ব্রিটিশ শাসক শ্রেনি ও খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা এই শিল্প কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল, পাশাপাশি তারা কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল এই শিল্পের প্রসারে, নদীয়া রাজবংশ কি ভূমিকা পালন করেছিল, এছাড়াও মৃৎশিল্পী সমাজের আর্থ সামাজিক অবস্থান, এবং নদীয়া জেলার মৃৎশিল্প পার্শ্ববর্তী জেলার মৃৎশিল্পের উপর কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল কিনা। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলিকে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে এই গবেষণা পত্রটিতে তুলে ধরা। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের শিল্পনির্মাণ শুধুমাত্র এই জেলা বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় মনে রাখতে হবে বহু শিল্পানুরাগী ব্রিটিশ ও ইউরোপের মানুষ বহু মূল্য দিয়ে এই শিল্প নিদর্শন তাদের দেশে নিয়ে গেছেন। কৃষ্ণনগরের পুতুল বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে তার নিজ শিল্প গুণে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর মত মানুষও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

সঠিক সাল ও তারিখের কোন প্রমাণ না থাকলেও সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ঐতিহ্য প্রায় দুশো বছরের। তবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণের আগে এই স্থানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ আমলে বাংলার গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে একুশে মার্চ তারিখের সভাই রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নদীয়া নামের একটি স্বতন্ত্র জেলা এবং তার কালেক্টর পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন।[১] ভৌগোলিক ভাবে কৃষ্ণনগর গাঙ্গেয় সমতল ভূমির ২৩^0 ২৪' উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৮^0 ৩১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই শহরের আয়তন ১৫.৮০ বর্গ কিলোমিটার। এই শহরের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা টানা হয়েছে সে কারণে এই স্থানের জলবায়ুতে চরম ভাব লক্ষ্য করা যায়। নদীবহুল নদীয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদী এই স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত একটি জলঙ্গি অপরটি অঞ্জনা যা এখন মৃতপ্রায়।

কৃষ্ণনগর পূর্বে রেউই গ্রাম নামে পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করে থাকবেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম থেকে হয়তো এই স্থানের নাম হয় কৃষ্ণনগর যেটা সম্পূর্ণ ভুল। নদীয়া রাজ রুদ্র রায় এর রাজত্বকালে (১৬৭৬-১৬৯৩) তিনি রেউই এর নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণনগর রাখেন। কারণ এখানে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ ছিলেন গোপ যাদের আরাধ্য দেবতা ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণনগর নামটি কৃষ্ণচন্দ্রের নাম থেকে হয়নি। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার এবং এরপর তার পুত্র গোপাল জমিদারীর ভার পান। গোপালের পুত্র রাঘবের শাসনকালেই তিনি নদীয়ার রাজধানী মাটিয়ারী থেকে রেউই গ্রামে স্থাপন করেন। নদীয়ার রাজ রাঘবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র রায়ের সময় নদীয়ার জমিদারী আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুঘল বাদশা আলমগীরের নিকট থেকে তিনি মহারাজ উপাধি পান। তবে নদীয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি উচ্চতার শিখর স্পর্শ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কালেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বিষ্ণুমহল, দরবার কক্ষ, দালানগুলিতে উন্নত পঙ্খের কারুকার্য করা হয়। তিনি বারো দোলের মেলার সূচনা করেন এবং তার সময়কালে জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভ হয়। যদি অনুমান করতে হয় যে দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনা ও রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণনগরের কুমোরেরা পরবর্তীকালে দক্ষ মৃৎশিল্পী হয়ে উঠেছেন তবে ধরে নিতে হবে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকেই।[২]

একটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা সর্বপ্রথম দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও এর কারণ হিসেবে নদীয়া রাজেদের মধ্যে উৎসব ও পার্বণের প্রতি আগ্রহের বিষয়টিও এই শিল্পের অগ্রগতির কারণ। এছাড়াও কৃষ্ণনগরের মাটি এই শিল্পের উপযোগী এখানকার মাটিতে বেলে এবং দোয়াশের সাথে এটেল এর মিশ্রণ আছে। এখানকার মাটি কাঁকর পাথর পাথর বিহীন এতে মূর্তি হয় নিখুঁত। নদীয়ার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে মাটির এমন মোলায়েম ভাব না থাকার কারণে মৃৎশিল্পে তাদের গুণমান এই স্থানের মত উন্নত নয়। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত বাস্তবমূর্তির অনুকরণ আর কোন জেলা করতে পারেনি তার অন্যতম কারণ এই স্থানের মাটি।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এই শিল্পীদের বর্ণ ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করাও একান্ত জরুরী। সাধারণত মাটির তৈরি হাঁড়ি, কলসি, সরা, যে সমস্ত শিল্পীরা তৈরি করেন সেই কুম্ভকার শ্রেণীই যে মৃৎশিল্পী হয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সব কুম্ভকার কিন্তু মৃৎশিল্পী হতে পারেনি। বাংলায় যে শুধুমাত্র কুম্ভকাররাই মূর্তি গড়ত এমনটা নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও মূর্তি, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করত। রাঢ় দেশে সাধারণত সূত্রধর শ্রেনিভুক্ত লোকেরাই প্রতিমা নির্মাণ করে থাকে। ভারতীয় হস্তশিল্প পর্ষদ প্রকাশিত 'crafts and craftsmen of West Bengal' (১৯৭৮) বই থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে কুমোর ছাড়াও অন্যান্য নানা জাতির শিল্পী পুতুল তৈরি ও মূর্তি নির্মাণে যুক্ত আছে।[৩] পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে মৃৎপাত্র নির্মাণের কাজ করেন রাজবংশীরা আবার কলকাতা, নদীয়া, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদের মতো স্থানে মূর্তি ও মৃৎপাত্র তৈরি করেন পাল উপাধিধারীরা।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে মূর্তি নির্মাণের অন্যতম স্থানগুলির মধ্যে মূলত ঘূর্ণি অন্যতম এই স্থানের পুতুলগুলি বাস্তবানুগ মনে হয়। আবার ঘূর্ণির কাছাকাছি নিকটবর্তী নতুনপাড়া, কুমোর পারার মূর্তিগুলি শিল্প-রসিকদের কাছে একটু হলেও

নগণ্য। সুতরাং সমগ্র কৃষ্ণনগরেই যে মৃৎশিল্প একই রকম তা কিন্তু নয়। কুমোর পারা ও ষষ্ঠীতলা সংলগ্ন এলাকার মৃৎশিল্পীরা মূলত ছোট ছোট পুতুল তৈরি করেন বড়দিন, ঝুলন যাত্রা, জন্মষ্টমীতে হরেক রকম পুতুলের সম্ভার এখানে পাওয়া যায়। এছাড়া রাজবাড়ি সন্নিহিত নতুন বাজার এলাকায় মৃৎশিল্পীরা মূর্তি নির্মাণ করেন। তবে ছাঁচের বদলে হাতে তৈরি বাস্তব মূর্তি ঘূর্ণির মৃৎশিল্পীদের বিশেষত্ব এখানেই তাদের শিল্পসত্ত্বা আর পাঁচটি জেলার থেকে আলাদা। তবে এদের পরিমাণ সীমিত। সীমিত হওয়া সত্ত্বেও এই স্বল্প সংখ্যক শিল্পীদের হাত ধরেই কৃষ্ণনগরে এসেছে বহু আন্তর্জাতিক সম্মান। ১৮৮৮ সালে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সম্পর্কে ভারতীয় জাদুঘরের সহকারি অবেক্ষক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন,

> “Krishnanagar modellers belong to the Hindu caste of kumars, or potters, one of the nine artisan classes of Bengal, whose rank stands just beneath the Brahmans and writers. From time immemorial the occupation of the caste has been to make earthen vessels, and the figurative representations of divine manifestation describe in scared books.”[8]

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সৃষ্টি ও পুষ্টি নদীয়া রাজবংশের হাত ধরে। এখানকার রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক এবং এই সংস্কৃতির সমৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন শক্তি দেবীর মূর্তি তারা তৈরি করতেন। এই স্থানে মৃৎশিল্পীরা অধিকাংশ শক্তি মূর্তি নির্মাণে তাদের কল্পনা শক্তির প্রয়োগ ঘটাতেন। নবদ্বীপে বৈষ্ণব মণ্ডলীর কীর্তন কে ছাপিয়ে যেতে রাস পূর্ণিমার পরিবর্তে পট পূর্ণিমার প্রচলন করেছিলেন নদীয়া রাজেরা। আমরা সাধারণত কালী মূর্তির বিভিন্ন রূপের সাথে পরিচিত ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, ছিন্নমস্তা, দক্ষিণেশ্বরের কালী, শ্যামা কালী, ডাকাত কালী, কৃষ্ণ কালী আরও কত রূপ, তবে এসবই মৃৎশিল্পীদের কল্পনা করে নির্মিত মূর্তি।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পে নারী ও পুরুষের উভয়েরই অবদান অনস্বীকার্য। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ছাঁচবিহীন মূর্তি নির্মাণ মূলত পুরুষরাই করতেন। মহিলারা পুতুল, খেলনা, সরার ওপর নকশা করা, চাকের সাহায্যে মাটির জিনিসপত্র তৈরি করতেন। বাড়ির শিশুরাও বাবা-মায়ের সাথে কাজে যোগান দিত। যার প্রতিফলন আমরা এখনো দেখতে পাই অনেক শিশুশিল্পী মাটির দূর্গা, কালী আরও নানান প্রতিমা নির্মাণ করে এবং সমাজের সেগুলি প্রশংসাও পায়। এক কথায় বলা যায় এটি একটি পারিবারিক শিল্পও বটে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের ক্ষেত্রে কাজের বিভিন্নতাও লক্ষ্য করার মতো কারণ এখানে কিছু পরিবার আছে যারা ঠাকুরগড়ে পুতুল গড়ে না, আবার কিছু পরিবার আছে যারা পুতুল গড়ে, ভাস্কর্য গড়ে কিন্তু ঠাকুর গড়ে না। আবার কিছু পরিবার আছে যারা পুতুল, ঠাকুর, ভাস্কর্য সবই তৈরি করে। এর পেছনে শিল্পীদের নিজস্ব পছন্দ, দক্ষতা, বাজারের চাহিদার মত বিষয়গুলি কাজ করে থাকে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের উদ্ভবের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার পরবর্তী বিষয়টি হল এই শিল্পের বিকাশ। একটা কথা শোনা যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই মৃৎ শিল্পীদের নাটোর থেকে এনেছিলেন কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রাথমিক তথ্য আজও অবদি পাওয়া যায়নি। জনৈক প্রফুল্ল কুমার সরকার ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ‘কৃষ্ণনগর রাজপরিবার’ নিবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩৬৪) লিখেছেন –

> “কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের আরম্ভ হইয়াছিল কৃষ্ণনগরের রাজার জন্য ‘নরনারীকুঞ্জর’ গঠন হইতে নয়টি নারী পুতুলের সমষ্টিতে করা হইয়াছিল এই অদ্ভুত পুতুল। বিখ্যাত মৃৎশিল্পী যদু পালের পূর্বপুরুষ গোপাল পাল ইহার স্রষ্ঠা।”[৫]

তার এই মতামত কতটা সত্য তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের সঙ্গে সমগ্র ভারতের এবং ভারতের বাইরের দেশের পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একজন ব্যক্তিত্ব হলেন ত্রৈলোক্য নাথ। উনিশ শতকের শেষের তিন দশকে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা চাকরি করেন এবং পরবর্তীতে তিনি উড়িষ্যার কটক জেলার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এর চাকরিও করেন। একটা সময় তিনি ভারতীয় প্রদর্শনী বিভাগের মুখ্য পরিচালক ছিলেন। এই চাকরিসূত্রে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্প ও শিল্পীদের সাথে পরিচিত হন। ১৮৮৩-৮৪ সালে অনুষ্ঠিত ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনের জন্য তিনিই বিভিন্ন কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করেন। এই সময় কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের সাথে তার পরিচয় হয়। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৫ সালে তিনি ‘বেঙ্গল ইকোনমিক অ্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম’ যেটি কলকাতা জাদুঘরের অন্তর্গত তিনি এই অংশটির

সহকারী অবেক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বিশদ বিবরণ তিনি তুলে ধরেন তার বই 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচারস অফ ইন্ডিয়া' তে। এই মানুষটির সাহায্যে এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের উদ্যম ও প্রচেষ্টায় এই শিল্পীদের কারুকার্য ভারত ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পাড়ি দেয়। কৃষ্ণনগরের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদ্রী ও মিশনারীদের উদ্যোগও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পকে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন যে শিল্পীরা তাদের মধ্যে যদুনাথ পাল উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৮ সালে এই প্রশংসা পত্রে স্যার এডওয়ার্ড বাক লিখেছেন -

> "jadunath was the prince of modellers in the 1880-90 decade and I believe just as loud now. He made the life size models for the 1886 exhibition and others undere meek of scientific measurement for the Paris ethnological museum. His specimens in Calcutta Museum etc. are very clever. It is so good that I hope he may continue to receive official encouragement."[৬]

যদুনাথ পাল রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তি কবির সামনে বসে নির্মাণ করেছিলেন তা দেখে কবি তার শিল্পগুনের প্রশংসা করেন। ভাইসরয় লর্ড লিটনের সময় কৃষ্ণনগরে আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় লর্ড লিটন এখানে আসেন এবং শিল্পী যদুনাথ পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কৃষ্ণনগরের সর্বপ্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ছিলেন শ্রীরাম পাল। এছাড়াও তার বংশধর রাখালদাস পাল উল্লেখযোগ্য। গ্লাসগো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ত্রৈলোক্যনাথ উদ্যোগ নিয়ে রাখাল দাস পালের কিছু মাটির মডেল পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - আসামের একটি চা বাগিচা, জমিদারের কাছারি, একটি বিয়ে ও তার শোভাযাত্রা, দূর্গাপূজায় বলিদান এর দৃশ্য, রথযাত্রা প্রভৃতি। উপরিউক্ত বিবরণ গুলি থেকে বোঝা যায় উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে মূলত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এই সময় নদীয়ার মৃৎশিল্প স্থানীয় শিল্পের আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে নিজেকে তুলে ধরে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎ শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম জীবনকৃষ্ণ পাল যাকে লোকে জি. পাল বলে ও জানে এছাড়া পরাণ চন্দ্র পাল তিনি কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা। এছাড়াও যদুনাথ, বক্রেশ্বর, রাখাল দাস প্রমুখ শিল্পীদের সময়ও ঘূর্ণির পুতুলপট্টি ছিল সরগরম। পরবর্তীতে পরানচন্দ্র ও তার সুযোগ্য বংশধর সতীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, নির্মলকৃষ্ণ, দীনবন্ধু, অশোক, গৌতম, সুবোধ, বিশ্বনাথ, সুবীর প্রভৃতি শিল্পীদের সময় কৃষ্ণনগরে দেশী বিদেশী ক্রেতাদের ভিড় ছিল দেখার মতো। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের দ্বারা নির্মিত উল্লেখযোগ্য কিছু মৃৎশিল্পের মধ্যে কার্তিক চন্দ্র দ্বারা নির্মিত রবীন্দ্র সদনের সামনে বসানো ব্রঞ্জের রবীন্দ্র মূর্তি। বেলুড় মঠের শ্বেত পাথরের তৈরি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্তি বিখ্যাত শিল্পী জি. পালের তৈরি। কৃষ্ণনগরের বহু শিল্পী নিজেদের ভাগ্য পাল্টাতে কলকাতার কুমোরটুলিতে নিজেদের আশ্রয় খুঁজে ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন গোপেশ্বর। তিনি ওয়েম্বলি প্রদর্শনী থেকে পুরস্কার পান। কলকাতার মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্যের বাজারে তিনি একজন সফল মৃৎশিল্পী ছিলেন। জে. এইচ. ই. গ্যারেটের মতে-

> "At Ghurni, superb of Krishnanagar, clay figures of remarkable excellence are manufactured; define a ready sale wherever offered, and have received medals at Europeans."[৭]

এছাড়াও পরানচন্দ্র পাল ও তার বংশধরের মৃৎশিল্পকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। কার্তিক চন্দ্র পালের আরও কিছু কাজ যা রাজ্যের বাইরে তার শিল্পীগুনের পরিচয় দেয় সেগুলি হল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী অরবিন্দ মূর্তি, ইম্ফলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি, আমেদাবাদে গুজরাট গভর্নমেন্ট হাউজে রবীন্দ্রনাথের মুখাবয়ব প্রভৃতি। এছাড়াও আরো কয়েকজন বিখ্যাত মৃৎশিল্পী হলেন গৌতম পাল, শম্ভু পাল, সুধীর কৃষ্ণ প্রমুখ। ১৮৫১ সালে লন্ডন থেকে শ্রীরামপাল কে পুরস্কৃত করা হয় এবং ১৮৬৭ সালে প্যারিস থেকে যদুনাথ পালকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারের দ্বারা যদুনাথ পাল ভূষিত হয়েছিলেন।

ঔপনিবেশিক কালে নদীয়ার এই কুটির শিল্প ব্রিটিশদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। যদুনাথ পালের শিল্পকর্ম দেখে তৎকালীন জেলা শাসক সি. সি. স্টিভেন সাহেব মুগ্ধ হয়েছিলেন তার লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই জেলার মৃৎশিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যকে সমাদর করে ব্রিটিশ শাসক শ্রেণী বিভিন্ন সময়ে তাদের শিল্পকর্মকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করতে সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে ভাইসরয় নর্থ ব্রুক, স্যার এডওয়ার্ড বাকের নাম উল্লেখযোগ্য।

তবে প্রদীপের নিচের অন্ধকার আজও বিদ্যমান তা কৃষ্ণনগরের কুমোর পাড়া গুলিতে একটু ঘুরলেই বোঝা যায়। এখানকার অধিকাংশ শিল্পী দারিদ্র ও হতাশার অন্ধকারে ডুবে আছে। শিল্পীরা অতীব যত্নে ঘর সাজানোর উপকরণ গুলি তৈরি করে কিন্তু পাইকারী বাজারে তার দাম পান খুব স্বল্প। প্রচুর মাটির পুতুল রং না করে শিল্পীরা অর্ডার অনুযায়ী পাইকারি দরে বেঁচে দেন। এরপর এই পুতুলগুলিকেই বড় মাপের শিল্পীরা রং করে তার ওপর একটা চড়া দামের ক্রয় মূল্যের কাগজ লাগিয়ে বিক্রি করেন। শৌখিন মানুষ চড়া মূল্যে সেটিকে কিনে বাড়ির ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু এতে করে কোন লাভের মুখই দেখতে পান না দরিদ্র মৃৎশিল্পীরা। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে যে কোনো কাজের গুণমান খারাপ হতে বাধ্য। এই শিল্পে যে পরিমানে খাটনি সে পরিমাণে অর্থ না থাকায় বহু কারিগর তাদের বংশধরদের এই শিল্পে আসার ক্ষেত্রে জোর করেন না যদি না তারা স্বেচ্ছায় আসেন। তবে অনেক প্রবীণ শিল্পীদের কথা অনুযায়ী এই শিল্পের উন্নতিতে সরকারি উৎসাহ দরকার এবং এর পাশাপাশি মানুষের মাটির জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দুটোই প্রয়োজন। দেশে বিদেশের বড় বড় এক্সিবিশনে নিজেদের সৃষ্টি তুলে ধরার যে উৎসাহ তৎকালীন শিল্পীরা পেয়েছেন তা এখন খুবই কম। বর্তমানের এই অর্থসর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় অনেক শিল্পীরাই শিল্পবোধ সঠিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না। ১৯৭১ - ৭২ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে নদীয়া জেলার মৃৎশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা [৮]

(১৯৭১-৭৩)

শিল্পের ধরন	শিল্পের নাম	মোট সংখ্যা
মৃৎশিল্প	ইটের ভাটা	৭২
	টালির ভাটা	৮৯
	কুমোরের কাজ	৩৯৮৭
	সুরকি কল	৪
	চিনামাটির কাজ	৮
	স্পান পাইপ ও সিমেন্টের দ্রব্য	৩

পশ্চিমবঙ্গের 'ব্যুরো অফ এ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস' ১৯৬৫-৬৬ সালে সারা পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংস্থাগুলির ওপর এক সমীক্ষা করে। তাতে দেখা যায় যে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই জেলায় মোট ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সংখ্যা ছিল ৪৬,৭৮০ এবং ওই সব সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯৮,০২০।[৯] ১৯৭৮ সালের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের দুর্গাদাস মজুমদার এই শিল্পের অবনতির কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন নতুন প্রজন্মের এই শিল্পে যোগদান না দেওয়া, এছাড়াও মাটির পুতুলগুলি সহজে ভঙ্গুর সেগুলি প্যাকিং করে দূর দেশে পাঠানো পরিশ্রমসাধ্য।[১০]

শিল্প সমালোচকদের মতে কৃষ্ণনগরের পুতুলের মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। তাদের পুতুল আগেকার লোকশিল্পের আদলে তৈরি যা নতুন বাঙালি প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম। শিল্প সমালোচকদের এত অভিযোগ কে আজও ছাপিয়ে যায় কৃষ্ণনগরের পুতুলের আন্তর্জাতিক চাহিদা। প্যাকিংয়ের অসুবিধা সত্ত্বেও এখানকার শিল্পকর্ম পৌঁছে যায় ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, স্পেন ও ফ্রান্সে। শিল্পীরা আজও তাদের পেশাকে ভালোবেসে শিল্প তৈরি করে দরকার সরকারি সহযোগিতা এবং সাধারণ মানুষের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ।

Reference:

১. নদীয়ার স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, কৃষ্ণনগর, ১৯৭৩, পৃ. ৫০

২. চক্রবর্তী, সুধীর, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. তদেব, পৃ. ৬

৪. http://www.tripoto.com

৫. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৬. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৭. গ্যারেট জে. এইচ. ই, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, নদীয়া, কলকাতা, ১৯১০, পৃ. ৯৪

৮. শিল্প স্মরণিকা, নদীয়া জেলা, ১৯৭২, পৃ. ৩৪-৩৬

৯. তদেব, পৃ. ৩১

১০. মজুমদার, দুর্গাদাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস: নদীয়া, ইনফরমেশন এ্যান্ড পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৬৫